بسم الله الرحمن الرحيم

সীরাহ

প্রথম খণ্ড

রেইনড্রপস

প্রকাশিত

সীরাহ

প্রথম খণ্ড

সম্পাদক	▪	জিম তানভীর
প্রথম প্রকাশ	▪	জুমাদা আস সানী ১৪৩৭ হিজরি, ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঈসায়ী
দ্বিতীয় প্রকাশ	▪	রবিউস সানী ১৪৩৭ হিজরি, মার্চ ২০১৮ ঈসায়ী
গ্রন্থস্বত্ব	▪	রেইনড্রপস
প্রচ্ছদ	▪	আনিকা ওয়ারদা তুবা
সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য	▪	২৫০ টাকা

www.raindropsmedia.org
www.facebook.com/raindropsmedia
rdmedia2014@gmail.com

শারঈ সম্পাদনা: শাইখ মুনীরুল ইসলাম ইবন জাকির

ISBN: 978-984-34-0250-9

সূ চি প ত্র

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর নগণ্য কিছু বান্দাকে তাঁর শ্রেষ্ঠতম বান্দার জীবনকথা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তৌফিক্ব দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ হচ্ছেন এমন একজন, চৌদ্দশ বছর পরেও যাকে নিয়ে মুগ্ধতা এতটুকু কমেনি। যারা তাকে জেনেছে, তারা তাঁকে ভালোবেসেছে; যত বেশি জেনেছে, তত বেশি ভালোবেসেছে। যারা তাঁকে জানেনি, তাঁরা ভালোবাসার নদী দেখলেও মহাসমুদ্র দেখেনি। না-দেখেও যাকে পৃথিবীর মানুষ সবচাইতে বেশি ভালোবেসেছে, তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ।

গল্পের নায়কদের কথা মানুষ খানিক বাদেই ভুলে যায়, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের প্রভাব টিকে থাকে বড়জোর কয়েকটা বছর, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একজন যাকে এত বছর পরেও লোকেরা ভালোবাসে, তাঁর অনুসরণ করে, তাঁর সম্মানে নিজের জীবন দিয়ে দেয়। জীবদ্দশায় আবু জাহেলরা তাঁকে ভয় করতো, মৃত্যুর পরে আবু জাহেলের উত্তরসূরিরা তাঁর অনুসারীদের ভয় করে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, যে জাতির কাছে 'মুহাম্মাদ' ﷺ আছে, সে জাতিকে আজ টং এর মামা থেকে শুরু করে বারাক ওবামা – প্রত্যেকেই দিকনির্দেশনা দিতে ব্যতিব্যস্ত। মুসলিমদের আজকে অমুসলিমরা ইসলাম শেখায়, উন্নয়ন আর সমৃদ্ধির সবক দেয়। বিষয়টা লজ্জা আর গ্লানির।

আমরা রাসূলুল্লাহকে ﷺ চিনলেও তাঁকে আমরা জানিনা। জানিনা বলেই তিনি কারো কাছে নিছক একজন 'ভালো মানুষ', আর দশজন মনীষির মতো, যারা কিনা কিছু দার্শনিক তত্ত্ব আর নীতিকথা বলে খালাস! কিংবা কারো কাছে তিনি একজন 'ধর্মপ্রচারক', কিছু ভালো ভালো কাজ করেছেন, এই যা!

কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় হচ্ছে তিনি একজন রাসূল। তিনি একটা গ্লোবাল মিশন নিয়ে এসেছিলেন এবং আমরা সেই মিশনের অংশ। আল্লাহ এই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটিকে পাঠিয়েছেন আমাদের জীবনের প্রতিটি বিষয়ে পথ দেখানোর জন্য। তিনি মানুষকে সেই পথ দেখিয়ে গেছেন যে পথ খুঁজে পেতে আমাদের বুদ্ধিজীবী-দার্শনিক-বিজ্ঞানী-আমলারা মাথা কুটে মরে, কিন্তু সমাধান খুঁজে পায় না।

এই সমস্যার একটিই সমাধান। তা হলো রাসূলুল্লাহকে ﷺ জানা। আর জানার জন্যই তাঁর সীরাহ পড়া। রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর ব্যক্তি জীবন, তাঁর

নবুওয়াত, তাঁর নেতৃত্ব এবং তাঁর চারপাশের মানুষগুলো নিয়ে একটি চমৎকার কাহিনীপ্রবাহ। রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ পড়লে ইনশা আল্লাহ, ইসলাম সম্পর্কে আমাদের সংকীর্ণ ধারণার দেয়ালগুলো ভেঙে যাবে। রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবন সম্পর্কে জানলে, ইসলামবিদ্বেষীদের প্রোপাগান্ডা শুনে আমাদের মনে যে 'খচখচ' হয় সেটা দূর হয়ে যাবে, বিইযনিল্লাহ। আমরা জানব রাসূলুল্লাহ ﷺ কত চমৎকার একজন মানুষ ছিলেন। তিনি কারো মন জয় করতেন, কাউকে রুখে দিতেন, আর কাউকে মোকাবিলা করতেন। নিজের ঘর থেকে শুরু করে যুদ্ধের ময়দান – প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব। যারা তাঁকে ভালোবেসেছে, তাদের জীবন আমূল বদলে গেছে, যে জাতি তাঁর অনুসরণ করেছে, তাদের ভাগ্য বদলে গেছে। এমন একজন মানুষ সম্বন্ধে যদি আমরা না জানি, না মানি, তাহলে তো আমরাই 'মিস' করলাম!

আদর্শিক দৈন্যতার কারণে ইতিহাস বলতে হয়তো আমরা ৫২ বা ৭১ এর আগে কিছু চিন্তা করতে পারি না, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের ইতিহাসের সামনে সকল ইতিহাসই ম্লান। পৃথিবীর যত বিপ্লব, তার সবক'টা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কিছু পরিবর্তন করে কয়েক দশক বা সর্বোচ্চ কয়েক শতক পরেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। কিন্তু যে বিপ্লবের সূচনা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন, সেটা চলবে ততদিন, যতদিন না মুসলিম জাতির সমগ্র পৃথিবীর উপর বিজয়ী হবে।

বাংলা ভাষায় রাসূলুল্লাহর ﷺ একাধিক সীরাহ থাকা সত্ত্বেও আমরা এই সীরাহতে হাত দিয়েছি মূলত দুটি কারণে। একটা হলো, মুসলিমরা সীরাহকে গল্প হিসেবে পড়ে, কিন্তু সেখান থেকে কিছু শেখে না। এই সমাজের আবু জাহেল কিংবা মুনাফিক্ব আবদুল্লাহ ইবন উবাইদেররকে তারা চিনতে পারে না। এই সীরাহতে প্রায় প্রতিটি ঘটনা থেকে কী শেখার আছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ব্যাপারটি ভাষাগত। দীর্ঘদিন ধরে ইসলামকে আমাদের দেশের মূলধারার শিক্ষা থেকে দূরে ঠেলে দেওয়ায় ইসলামী সাহিত্যের সাথে সাধারণ মানুষের বেশ দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশের স্কুল-কলেজগুলোতে যে ধরনের সাহিত্য আমরা পড়েছি, সেগুলোর সাথে ইসলামী সাহিত্যকর্মের ভাষাগত ব্যবধান তৈরি হওয়ায় বরেণ্য আলিমদের লেখা বইগুলো পড়েও মানুষ যথাযথভাবে উপকৃত হতে ব্যর্থ হচ্ছে। এই সীরাহ সেই ব্যবধানকে কমিয়ে আনার প্রয়াস। চৌদ্দশো বছর আগের কথাগুলো যেন আমরা আমাদের পরিস্থিতির সাথে মেলাতে পারি, সেই সময়ের আলোয় নিজেদের দেখতে পারি সে জন্য প্রয়োজন ভাষাগত দেয়ালটি ভেঙে ফেলা। সে উদ্দেশ্যে এই সীরাহতে কাহিনিগুলোকে বর্ণনা করা হয়েছে কিছুটা আধুনিক যুগের ঢঙে, যেন পাঠক স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে নবীজির যুগে প্রবেশ করতে পারে।

এই সীরাহর বিষয়বস্তুগুলো মূলত নেওয়া হয়েছে শাইখ আলি আস-সাল্লাবির রচিত সীরাহ এবং আর-রাহীকুল মাখতুম থেকে। রেইনড্রপস এর ভাইবোনেরা চেয়েছে

কেবল একটি প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় সীরাহ উপহার দিতে, যেন রাসূলুল্লাহকে ﷺ আমরা ভালোবাসতে পারি, তাঁর জন্য জীবন দিতে পারি।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম।

জিম তানভীর
২০ রবিউস সানি, ১৪৩৭ হিজরী।

সীরাহ নিয়ে কিছু কথা

সীরাহর সংজ্ঞা

সীরাহ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো পথ বা রাস্তা। আরবিতে সাইর মানে হাঁটা, কেউ যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় হেঁটে যায় তখন আরবিতে বলা হয় সাইরতু ফুলান, অর্থাৎ অমুক হাঁটছে।

সীরাহ বলতে এমন একটি পথ বুঝায় যার উপর দিয়ে একজন ব্যক্তি তার জীবনভর হেঁটে চলে। হান্স ডিকশনারিতে (Dictionary of Modern Written Arabic by Hans Wehr) সীরাহর যে সব অর্থ দেওয়া হয়েছে তা হলো: আচার-ব্যবহার, চালচলন, মনোভাব, জীবনযাত্রার ধরন, সামাজিক অবস্থা, প্রতিক্রিয়া, কাজকর্মের ধরন ও জীবনী–এই সবগুলোই সীরাহ এর অন্তর্ভুক্ত। সীরাহ বলতে শুধুমাত্র মুহাম্মাদের ﷺ জীবনী বোঝায় না বরং তা দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির জীবনীকেই বোঝানো হয়। কিন্তু মুহাম্মাদের ﷺ এর জীবনীর সাথে সীরাহ শব্দটি এত বেশি ব্যবহার করা হয়েছে যে, সীরাহ বলতে অধিকাংশ সময় নবীজি মুহাম্মাদের ﷺ জীবনীকেই বোঝানো হয়। সীরাহ বলতে যেহেতু যেকোনো ব্যক্তির জীবনচরিতকে বোঝায় তাই আবু বকরের ﷺ সীরাহ, উমারের ﷺ সীরাহ – এভাবে বললেও ভুল হবে না।

সীরাহ অধ্যয়ন করার গুরুত্ব

১) ইসলামের ইতিহাস জানা

রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনকে ঘিরেই ইসলামের ইতিহাস। তাঁর জীবন অধ্যয়নের মাধ্যমেই ইসলামের আসল ইতিহাস জানা যাবে, অর্থাৎ তাঁর পুরো জীবনকাল হলো ইসলামের ইতিহাস জানার একটি উপযুক্ত মাধ্যম। তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতিগুলো জানা বর্তমান সময়ের দাওয়াতি কাজের জন্য খুবই জরুরি। রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ অধ্যয়ন তাই নিছক একজন ব্যক্তির জীবন নিয়ে আলোচনা নয় বরং রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ হলো মুসলিম জাতির ইতিহাস, দ্বীন ইসলামের ইতিহাস।

দুনিয়াতেই জান্নাতের সুখবরপ্রাপ্ত ১০ জন আশরা-ই-মুবাশশারাহর একজন হলেন সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস ﷺ। তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ ইবন সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস ﷺ বলেন, 'আমাদের পিতা (সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস) রাসূলুল্লাহর ﷺ পরিচালিত যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন, তিনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ পড়ানোর সময় বলতেন, এগুলো হলো তোমাদের বাপ-দাদাদের ঐতিহ্য, কাজেই এগুলো নিয়ে পড়াশোনা করো।' তাঁরা সীরাহকে মাঘাযি বলে অভিহিত করতেন, মাঘাযি মানে যুদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনের শেষভাগের প্রায় পুরোটা সময় বিভিন্ন যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তাই তাঁরা মাঘাযি বলতে তাঁর পুরো জীবনকেই নির্দেশ করতেন।

আলী ইবন আবি তালিবের ﷺ নাতি আলী ইবন হুসাইন ইবন আলী ইবন আবি তালিব বলেছেন, 'আমাদেরকে যেভাবে কুরআন শেখানো হয়েছিল ঠিক সেভাবেই রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনীও পড়ানো হয়েছিল।' অর্থাৎ সীরাহ তাঁদের কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে কুরআন অধ্যয়ন করার পেছনে তাঁরা যেভাবে সময় দিতেন সীরাহর পেছনেও ঠিক একইভাবে সময় দিতেন।

সীরাহ অধ্যয়ন করা কেন এতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। কুরআন থেকে মূসা ﷺ বা ঈসার ﷺ জীবন সম্বন্ধে যতটা বিস্তারিত জানা যায়, ততটা রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবন সম্বন্ধে জানা যায় না। তাই রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে অবশ্যই তাঁর সীরাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।

২) রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি ভালোবাসা

সীরাহ অধ্যয়ন করার একটি অন্যতম কারণ হলো অন্তরে মুহাম্মাদের ﷺ প্রতি এক গভীর ভালোবাসা গড়ে তোলা। নবীজিকে ﷺ ভালোবাসা হলো ইবাদাত। দ্বীনের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি ভালোবাসা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান এবং সব মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হই।'

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহকে ﷺ সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসতে না পারা পর্যন্ত পরিপূর্ণ মু'মিন হওয়া যাবে না। সুতরাং মুহাম্মাদকে ﷺ কে ভালোবাসা হলো ইসলামের একটি অংশ।

উমার ইবন খাত্তাব ﷺ ছিলেন খুবই সৎ ও স্পষ্টভাষী একজন মানুষ, তিনি যা বলার তা সরাসরি বলে ফেলতেন। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আমি নিজেকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসি, আমি নিজেকে ছাড়া অন্য সবকিছুর চাইতে আপনাকে বেশি ভালোবাসি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'যতক্ষণ না আমাকে ভালোবাসতে পারবে', এর মানে হলো যতক্ষণ না আমাকে নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি পরিপূর্ণ ঈমান অর্জন করতে পারবে না। এরপর উমার ইবন খাত্তাব ﷺ বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাহলে আমি আপনাকে আমার নিজের চেয়েও বেশি ভালবাসি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আল-আন আমানতা', অর্থাৎ 'এখন তুমি পরিপূর্ণ ঈমান অর্জন করেছ।'

এই উম্মাহও মুহাম্মাদকে ﷺ ভালোবাসে। যে কোনো মুসলিমকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে সে রাসূলুল্লাহকে ﷺ ভালোবাসে কিনা তাহলে সে নিশ্চয়ই উত্তর দেবে, 'হ্যাঁ, বাসি।'

কিন্তু কারও সম্পর্কে ভালোভাবে না জেনে তাকে মনের গভীর থেকে, আন্তরিকভাবে ভালোবাসা যায় না। কাউকে ভালোবাসতে হলে তার সম্পর্কে জানা চাই। আর নবীজির ﷺ ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে সত্য, কেননা তিনি এমন একজন মানুষ যার সম্পর্কে যত জানা হয়, ততই তাঁর ব্যক্তিত্ব পাঠককে মুগ্ধ করে এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসাও তৈরি হয়। যদিও বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিমরা তাঁর সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জেনেই তাঁকে ভালোবাসে, তারপরও তাঁর সম্পর্কে ভালোভাবে না জানা পর্যন্ত তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসার জন্ম নেবে না। তাই দেখা যায় যে, সাহাবারা ﷺ রাসূলকে ﷺ যত বেশি জানতেন, তাঁরা তত বেশি তাঁর সান্নিধ্য পেতে চাইতেন এবং তাঁকে তত বেশি ভালোবাসতেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমর ইবন আল আসের ﷺ কথা। তিনি ছিলেন এক সময় রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘোরতর শত্রু। ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ও দুশমনদের মধ্যে অন্যতম। পরবর্তীতে একসময় তিনি মুসলিম হন। মৃত্যুশয্যায় তিনি হঠাৎ কাঁদতে শুরু করেন। পিতাকে মৃত্যুশয্যায় কাঁদতে দেখে ছেলে আবদুল্লাহ ইবন আমর ﷺ বললেন, "বাবা, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আপনাকে (ঈমানের) সুসংবাদ দেননি?"

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমর ইবন আল আস ﷺ সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমানা আমর', অর্থাৎ আমর ইবন আল আস ঈমান অর্জন করেছে। খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমর ইবন আল আসের ﷺ মু'মিন হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি শুধুমাত্র একজন মুসলিমই ছিলেন না, বরং উঁচু স্তরের একজন মু'মিনও ছিলেন। তাই তাঁর পুত্র তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিল যে, "আপনি একজন মু'মিন। যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে এই সুসংবাদ দিয়েছেন সেখানে আপনি মৃত্যুর পূর্বে এভাবে কান্নাকাটি করছেন কেন?"

আমর ইবন আল আস ﷺ তাঁর ছেলের দিকে ফিরে কথা বলতে শুরু করলেন। তাঁর ভাষায়–

আমি আমার জীবনে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করে এসেছি। জীবনের প্রথম ভাগে আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ। তাঁর প্রতি আমার বিদ্বেষ এতটাই তীব্র ছিল যে, তাঁকে যেকোনোভাবে পাকড়াও করে হত্যা করার ব্যাপারে আমি ছিলাম বদ্ধপরিকর। এটাই ছিল আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা, তীব্র বাসনা। যদি সে সময় আমি মারা যেতাম তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমার স্থান হতো জাহান্নামে।

কিন্তু এরপর আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দেন। আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে বললাম, 'হে মুহাম্মাদ ﷺ, আমি মুসলিম হতে চাই! আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার কাছে বাই'আত দিব।'

কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ যখন হাত সামনের দিকে বাড়ালেন তখন আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?'
-আমার একটি শর্ত আছে।
-কী শর্ত?
-আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হোক, এটাই আমার শর্ত।

আমর ইবন আল আস ؓ জানতেন যে, তিনি অতীতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যা যা করেছিলেন তা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই তিনি নিশ্চিত হতে চাইছিলেন যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তাঁর অতীতের কার্যকলাপের জন্য পাকড়াও না করেন।

তখন নবীজি ﷺ বললেন, 'হে আমর, তুমি কি জানো না যে, ইসলাম তার আগের সমস্ত গুনাহ মুছে দেয়, হিজরত তার আগের সমস্ত গুনাহ মুছে দেয় এবং হাজ্জ তার আগের সমস্ত গুনাহ মুছে দেয়?'

আমর ইবন আস ؓ বলতে থাকেন, 'তারপর আমি মুসলিম হয়ে গেলাম। তখন থেকে মুহাম্মাদের ﷺ চেয়ে অন্য কোনো ব্যক্তি আমার কাছে অধিক প্রিয় ছিল না। অথচ তিনিই কিনা একসময় আমার ঘোরতর শত্রু ছিলেন।

তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধাবোধ এতটাই তীব্র ছিল যে, আমি কখনো তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারিনি। কেউ যদি আমাকে তাঁর দৈহিক সৌষ্ঠব বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করত তাহলে আমার পক্ষে তাও সম্ভব হতো না। আমি যদি সে সময় মারা যেতাম তাহলে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশা করতে পারতাম...'

এই হাদীসটি এখানেই শেষ নয়, এর পরে আরও কিছু অংশ রয়েছে। কিন্তু এই হাদীস থেকে প্রাসঙ্গিক বিষয় হলো, যে নবীজিকে ﷺ আমর ইবন আস একসময় চরম শত্রু বলে গণ্য করতেন, সেই মুহাম্মাদকে ﷺ তিনি যখন কাছ থেকে দেখলেন, তাঁকে জানতে শুরু করলেন, তখন থেকে তিনিই হয়ে গেলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।

সুলাহ আল হুদাইবিয়্যাহ অর্থাৎ হুদাইবিয়ার সন্ধির আগে কুরাইশরা সুহাইল ইবন আমরকে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে পাঠায়। উদ্দেশ্য ছিল মুহাম্মাদের ﷺ সাথে দফা-রফা করা। সুহাইল ইবন আমর ছিল একজন উঁচুমানের কূটনীতিক। তাকে পারস্য, রোমান ও আবিসিনিয়ান সাম্রাজ্যের দরবারে রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাঠানো হতো। তিনি বেশ সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তাকেই কুরাইশরা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে পাঠিয়েছিল আপস-মীমাংসা করার জন্য।

সুহাইল ইবন আমর মদীনায় গেল। সেখানে গিয়ে স্বচক্ষে আবিষ্কার করল সাহাবারা ؓ

নবীজিকে ﷺ কতটা ভালোবাসেন, তাঁর সাথে কেমন আচরণ করেন। কাজ শেষে সুহাইল ইবন আমর মক্কায় ফিরে আসল। কুরাইশদেরকে বলল,

'আমি রোমান সাম্রাজ্য দেখেছি, পারস্যের বাদশাহর দরবারেও গিয়েছি। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীকে দেখেছি। কিন্তু এ পর্যন্ত মুহাম্মাদের ﷺ মতো এমন কোনো নেতা দেখিনি যাকে তাঁর অনুসারীরা এত বেশি ভালবাসে, এত বেশি সম্মান করে! আমি দুনিয়াতে তাঁর মতো আর কাউকে দেখিনি। রোমান, পারস্য ও আবিসিনিয়ার বাদশাহদের যদিও অনেক ক্ষমতা, শক্তিসামর্থ্য ও বিশাল সাম্রাজ্য আছে, কিন্তু মুহাম্মাদের ﷺ প্রতি তাঁর অনুসারীদের যে ভালোবাসা আমি দেখেছি তা অন্য কোথাও দেখিনি।

আমি দেখেছি অসাধারণ কিছু বিষয়। যখন মুহাম্মাদ ﷺ অযু করেন, তখন সাহাবারা ﷺ তাঁর কাছে কাছেই থাকেন যেন তাঁর দেহ থেকে অযুর পানি চুইয়ে পড়া মাত্রই তা সংগ্রহ করতে পারেন। তোমরা যা খুশি তাই করতে পারো, কিন্তু মনে রেখ এই মানুষগুলো তাদের নেতাকে কোনোদিনও ছেড়ে যাবে না।'

আসলেই সাহাবাগণ ﷺ কখনোই রাসূলুল্লাহকে ﷺ পরিত্যাগ করেননি। তাঁরা নিজের জীবন দিয়েছেন, তাঁর জন্য তাঁরা সবকিছু ত্যাগ করেছেন, কিন্তু কখনো তাঁকে ছেড়ে যাননি।

তাই সত্যিকার অর্থে নবীজিকে ﷺ ভালোবাসতে হলে অবশ্যই তাঁর সম্পর্কে আরও বেশি করে জানতে হবে। যদিও মানুষজন তাঁর সম্পর্কে খুব বেশি জানে না, তাঁর জীবনী নিয়ে পড়াশোনা করেনি, তারপরেও দুনিয়ার বুকে মানুষ তাঁকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছে । তাঁর নাম হলো দুনিয়ার সবচেয়ে পরিচিত নাম। তাই দুনিয়াতে শত-শত হাজার-হাজার মানুষ পাওয়া যাবে যাদের নাম ভালোবেসে মুহাম্মাদ রাখা হয়েছে। ইতিহাসে এমন আর কোনো ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার নামে এত মানুষের নাম রাখা হয়েছে।

যদি তাঁর ব্যাপারে খুব ভালোভাবে না জানা সত্ত্বেও মানুষ তাঁকে ভালবাসে, তাহলে যে তাঁর জীবনী অধ্যয়ন করবে তার ভালোবাসা কেমন হবে সে তো চিন্তার বাইরে! রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদের ﷺ নাম পৃথিবীর বুকে সর্বাধিক উচ্চারিত নাম। পৃথিবীর বুকে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে তাঁর নাম উচ্চারিত হয় না। প্রতিটি সেকেন্ডে, প্রতিটি মিনিটে, পৃথিবীর কোথাও না কোথাও অন্তত একজন মুয়াযযিনের মুখে তাঁর নাম প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হচ্ছে, *"আশহাদু* আল্লা *ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।"*

মুহাম্মাদ শব্দের মানে হলো প্রশংসিত আর এই দুনিয়াতে মুহাম্মাদের ﷺ মতো প্রশংসিত দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নেই। তাঁর নাম যথার্থতা লাভ করেছে কারণ, তিনি সদা

প্রশংসিত এক ব্যক্তি। তাঁর নাম শুনলে মুসলিমরা তাঁর প্রশংসা করে বলে, “সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।” তাই তাঁকে ভালোবাসতে হলে তাঁর সীরাহ অধ্যয়ন করা কর্তব্য। তাঁর সম্পর্কে যত বেশি জানা যাবে, তাঁর প্রতি ভালোবাসা তত বেশি বৃদ্ধি পাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> **“বল, তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছো, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করো এবং সে বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করো – যদি এগুলো তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত। আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।” (সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ২৪)**

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে মুসলিমদের ভালোবাসার সর্বোচ্চ হক্বদার হলেন আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসূল ﷺ এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা। পিতা, পুত্র, ভাই, নিজ গোত্র, ধন-সম্পদ সবকিছুর চেয়ে এই তিনটি বিষয় অধিক প্রিয় হতে হবে। প্রতিটি মুসলিমের কাছে আল্লাহর রাসূল ﷺ ও ইসলাম সবকিছুর চেয়ে প্রিয় হওয়া উচিত।

৩) সর্বোত্তম আদর্শের অনুসরণ

ইবন হাজার বলেছেন, ‘কেউ যদি আখিরাতের জীবনে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে চায়, দুনিয়াবি জীবনে প্রজ্ঞা হাসিল করতে চায়, জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য বুঝতে চায় এবং নিজের মাঝে প্রকৃত নৈতিকতা ও উন্নত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ দেখতে চায়, তবে সে যেন রাসূলুল্লাহর ﷺ পথ অনুসরণ করে।’ মুহাম্মাদ ﷺ এর ছিল সর্বোশ্রেষ্ঠ আখলাক্ব। তাঁর মাঝে যাবতীয় অসাধারণ গুণাবলির অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। তাই তাঁর সীরাহ অধ্যয়ন করার মাধ্যমে তাঁকে আরও বেশি করে অনুসরণ করা সম্ভব হবে।

৪) কুরআনকে অনুধাবন

কুরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলো ওয়াহী নাযিল হওয়ার সময়কার পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল নয়, যেমন, আখিরাত সম্পর্কিত আয়াতসমূহ। পরিবেশ-পরিস্থিতি যাই থাকুক না কেন এ আয়াতগুলো সবসময় স্বতন্ত্র থাকে। আবার কুরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ সময়ে সংঘটিত কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে। তাই দেখা যায় যে কিছু আয়াত কোনো ঘটনার পূর্বে নাযিল হয়েছে অথবা ঘটনা ঘটার সময়ে নাযিল হয়েছে কিংবা ঘটনা ঘটার পরে নাযিল হয়েছে।

সীরাহ এসব আয়াতের বিস্তারিত বিবরণ দেয়। এর মাধ্যমে কোন ঘটনার প্রেক্ষাপটে কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে–তা সীরাহ থেকে জানা যায়। যেমন, সূরা আল আহযাবের অধিকাংশ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আল-আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। আবার সূরা আলে ইমরানে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যা রাসূলুল্লাহর ﷺ সময়ে সংঘটিত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা আলে ইমরানের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যকার কিছু কথোপকথন। মূলত নাযরান থেকে আগত খ্রিস্টান প্রতিনিধিদলের সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ কথোপকথনে রাসূলুল্লাহকে ﷺ সমর্থন যোগানোর জন্যই এই আয়াতসমূহ নাযিল হয়। আর আলে ইমরানের পরবর্তী অংশে গাযওয়ায়ে উহুদ অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা এই সূরাতে দেওয়া হয়নি। একমাত্র সীরাহ অধ্যয়ন করার মাধ্যমেই আয়াতগুলোকে যথাযথ পরিস্থিতির নিরিখে বোঝা সম্ভব।

৫) মুহাম্মাদের ﷺ জীবন ইসলামি আন্দোলনের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত

রাসূলুল্লাহর ﷺ নবুওয়াতের জীবন বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। প্রথমে তিনি গোপনে দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন। এরপর তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াহ দেওয়া শুরু করেন এবং পরবর্তীতে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ পরিচালনা করেছেন। ইসলামি আন্দোলনে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য এই পর্যায়গুলোর মাঝে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূলুল্লাহর ﷺ গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল ওয়াহী দ্বারা নির্দেশিত। নিছক পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ হুটহাট সিদ্ধান্ত নিতেন না। বরং আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে ﷺ প্রতিটি পদে সঠিক পথে পরিচালনা করেছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনে যা কিছু ঘটেছে তা কোনো এলোমেলো বা আকস্মিক ঘটনাবলির সমষ্টি নয়, বরং এ সকল ঘটনা ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পরিকল্পনার অংশ, যাতে দ্বীন ইসলামকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার সময় এসব ঘটনা মুসলিম উম্মাহর জন্য দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। সুতরাং ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব ধাপ অতিক্রম করেছেন সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব পর্যায় পার করেছেন সেগুলোও খেয়াল রাখতে হবে।

সীরাহ এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, সীরাহ সাহাবাদেরকে ﵃ শিখিয়েছিল কুরআনের শিক্ষা কীভাবে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। সীরাহ তাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা ও মধ্যপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দেয়। কুরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে মৌখিক নির্দেশ, আর সীরাহ হলো সেই নির্দেশের বাস্তব প্রতিফলন। অন্য নবীদের সীরাহ সংরক্ষিত নেই, কিন্তু মুসলিমদের কাছে কুরআন-সুন্নাহর পাশাপাশি সীরাহও সংরক্ষণ করা আছে।

কুরআনের একটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, রামাদানে কালো সুতা থেকে সাদা সুতা আলাদা না হওয়া পর্যন্ত সেহরি খাওয়া যাবে। একজন সাহাবী ﵁ এই আয়াতটির

আক্ষরিক অর্থের উপর আমল করা শুরু করে দিলেন। তিনি তাঁর বালিশের নিচে একটি সাদা সুতা ও একটি কালো সুতা রাখলেন। এরপর তিনি খেলেন। তারপর আবার বালিশ সরিয়ে দেখলেন যে সুতা দুটির মাঝে পার্থক্য করা যায় কি না। যখন তিনি দেখলেন যে, সুতার রঙে কোনো পরিবর্তন আসেনি তখন আবার খাওয়া শুরু করলেন। এরকম করে অনেকক্ষণ চলতে লাগল অবশেষে তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে ব্যাপারটা খুলে বললেন। সব শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে ফেললেন এবং বললেন যে, 'এই আয়াতের মানে এই নয় যে তুমি সুতার দিকে তাকিয়ে থাকবে, বরং সাদা সুতা বলতে এখানে দিগন্তে উত্থিত সূর্যের প্রথম আলোকে বোঝানো হচ্ছে।' অর্থাৎ আয়াতটির বাস্তব প্রয়োগ কী রকম হবে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সাহাবীকে ﷺ শিখিয়ে দিলেন। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কীভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে তা নবী মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণের ﷺ জীবন থেকে জানা সম্ভব।

৬) সীরাহ অধ্যয়ন একটি ইবাদাত

সীরাহ বিনোদনের জন্য নয়, এটি একটি ইবাদাত। তাই সীরাহ অধ্যয়নের জন্য আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে উত্তম প্রতিদান রয়েছে। যে জমায়েতে রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ অধ্যয়ন করা হয়, সে জমায়েত আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার জমায়েত, আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করার জমায়েত। আর যে জমায়েতে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা হয়, ফেরেশতারা সে জমায়েত ঘিরে থাকেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> **"বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আলে ইমরান, ৩: ৩১)**

৭) মুসলিম হিসেবে নিজেদের পরিচয় গড়ে তোলা

বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী একটি অপসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে যা জোর করে সবার উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শক্তি প্রয়োগ করে হলেও এই অপসংস্কৃতি গ্রহণে বিশ্ববাসীকে বাধ্য করা হচ্ছে। থমাস ফ্রাইডম্যান আমেরিকার একজন বিখ্যাত লেখক, নিউইয়র্ক টাইমসে লেখালেখি করেন। তিনি বলেছেন, 'পুঁজিবাদী অর্থনীতির পেছনে রয়েছে একটি অদৃশ্য কালো হাত। ম্যাকডোনাল্ড বার্গারকে আপনার ঘরের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে চাই ম্যাকডোনাল্ড ডগলাসের জঙ্গিবিমান F-15!' অন্যভাবে বলা যায় যে, এই অপসংস্কৃতি মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। কারো পছন্দ-অপছন্দকে এই অপসংস্কৃতি কোনো রকম তোয়াক্কা করে না। *হয় ম্যাকডোনাল্ড বার্গার কিনে খাও, নতুবা ম্যাকডোনালড ডগলাসের জঙ্গিবিমান F-15 তোমার আকাশসীমানায় হাজির হবে*। এটি এমন একটি সংস্কৃতি যা কিনা ভিন্নমত একদমই সহ্য করতে পারে না। এটি দুনিয়ার বুক থেকে অন্য সব মতাদর্শকে উপড়ে ফেলতে চায়। আলেকজান্ডার সলযেনিতসিন নামক একজন বিখ্যাত রাশিয়ান ইতিহাস-

রচয়িতা বলেছেন, 'একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হলে অবশ্যই তার শেকড় কেটে দিতে হবে।' কাজেই, বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে যে ভোগবাদী সংস্কৃতি ছড়িয়ে ও চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর মানুষের জন্য একটি অশনি সংকেত, কেননা এটি সকল সংস্কৃতি ও বিশ্বাসকে দুনিয়ার বুক থেকে উচ্ছেদ করে দিতে চায়।

ইসলাম ব্যতীত অন্য সব মতাদর্শ আজ এই বৈশ্বিক সংস্কৃতির সামনে মুখ থুবড়ে পড়েছে। ইসলাম একটি জীবনব্যবস্থা যা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং দুনিয়ার সকল আদর্শকে মোকাবিলা করতে সক্ষম। দুনিয়ার সমস্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার সামর্থ্য থাকলেও কিছু মুসলিম আজ ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কিছুটা সন্দিহান। চারপাশে ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলার চেষ্টা করেন এমন অনেক মুসলিম রয়েছেন, কিন্তু মুসলিম হিসেবে যে একটি স্বকীয়তা বা নিজস্ব পরিচয় রয়েছে তা অধিকাংশের মাঝে অনুপস্থিত। রকস্টার বা ফুটবল খেলোয়াড়ের সাথে একজন গড়পড়তা মুসলিমের যতটা সাদৃশ্য দেখা যায় ততটা একজন সাহাবীর ﷺ সাথে দেখা যায় না। এই যুগের যুবকেরা সাহাবীদের ﷺ সম্পর্কে যতটা না জানে তার চেয়েও অনেক বেশি জানে খেলোয়াড়দের সম্পর্কে। এমনকি তারা নবী-রাসূলদের সম্পর্কেও তেমন কিছু জানে না। আজকের দিনের অল্প ক'জন যুবকই আল্লাহ তাআলার সব নবী-রাসূলদের নাম বলতে পারবে, বা সাহাবীদের ﷺ নাম মনে রাখতে পারবে। কিন্তু সেই একই ব্যক্তিকে তার প্রিয় ফুটবল টিমের অথবা ক্রিকেট খেলোয়াড়দের নাম জিজ্ঞেস করা হলে দেখা যাবে সে হড়বড় করে অনেক কথা বলে ফেলছে। মুসলিমদের মাঝে আত্মপরিচয়ের যে সংকট দেখা দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে তীব্র আকার ধারণ করেছে।

এই পরিচয়সংকট দূর করার জন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি তা হলো:

- ইসলামি ইতিহাসের উপর ভালো দখল থাকতে হবে। তাদের সিলেবাসে যেসব বিষয় থাকা খুব জরুরি সেগুলো হলো রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ, নবীদের জীবনী, সাহাবীদের ﷺ জীবনকাহিনি এবং সবশেষে মুসলিমদের সামগ্রিক ইতিহাস। সুতরাং প্রথম পদক্ষেপ হলো ইসলামের ইতিহাস জানার মাধ্যমে নিজেদের একটি পরিচয় গড়ে তোলা, কারণ এই ইতিহাস মুসলিমদের নাড়ির ইতিহাস, মুসলিমদের অস্তিত্ব।

- সমগ্র মুসলিম জাতি এক উম্মাহ। নিজেকে পুরো মুসলিম উম্মাহর একজন সদস্য মনে করতে হবে। জাতীয়তার ভিত্তিতে মুসলিমদের এককেজনের যে পরিচয় রয়েছে তা যেন মুসলিম পরিচয়ের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। মুসলিমদের মধ্যে কেউ আছে কুয়েতি, আমেরিকান, ব্রিটিশ বা পাকিস্তানী, তবে এই জাতীয়তাবাদী পরিচয় যেন মুসলিম পরিচয়ের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ না হয়ে যায়। ইসলাম কিন্তু এই জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা দূর করার জন্যই এসেছে। মুসলিমদের আনুগত্য হলো আল্লাহ তাআলা ও দ্বীন ইসলামের প্রতি । তাই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলিম ভাইবোনদের খোঁজখবর রাখতে হবে। ফিলিস্তিনে কী-হচ্ছে, না-হচ্ছে সে ব্যাপারে প্রতিটি ব্রিটিশ মুসলিমের উদ্বিগ্ন থাকা উচিৎ। প্রতিটি আমেরিকান মুসলিমের

উচিৎ কাশ্মীরের ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখা। মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি কোণে কী ঘটছে সে ব্যাপারে মুসলিমদের এমনভাবে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিৎ যেন তা নিজের বাড়িতেই ঘটছে। নিজেদের আত্মপরিচয় গড়ে তোলার ব্যাপারে এগুলো খুবই জরুরি উপাদান।

আলেকজান্ডার সলযেনিতসিন বলেছেন, 'একটি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য প্রথমেই সেই জাতিকে তাদের শেকড় কেটে দিতে হবে, তাদেরকে তাদের ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে হবে।' ধ্বংস থেকে বাঁচতে হলে শেকড়কে চেনার প্রথম পদক্ষেপ তাই রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবন সম্পর্কে জানা।

- মুহাম্মাদের ﷺ রিসালাতের প্রমাণ হলো তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা। রাসূলুল্লাহর ﷺ সবচেয়ে বড় মু'জিযা হলো কুরআন। এছাড়া রাসূলুল্লাহর ﷺ রিসালাতের প্রমাণ হিসেবে আরও অনেক মু'জিযা ছিল। তবে তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহই রিসালাতের অন্যতম প্রমাণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত অতি সাধারণ জীবনযাপন করেছেন। এ সময়ে তাঁর ব্যবহার, কথাবার্তা, চলাফেরা ও চরিত্র ছিল সত্যিই চোখে পড়ার মতো। কিন্তু তিনি কোনোদিন ক্ষমতা বা আধিপত্য লাভের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ যে পরিবর্তনের সূচনা করেছেন তা এক অভূতপূর্ব বিষয়, অবিশ্বাস্য বিষয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন নিরক্ষর। যে মানুষটি লিখতে-পড়তে জানতেন না তিনি কিনা এমন একটি কিতাবের সাথে সবার পরিচয় করিয়ে দিলেন যার মতো দ্বিতীয় আর কোনো কিতাব রচনা করা সম্ভব হয়নি এবং হবেও না। এমন নজির রয়েছে ভুরি ভুরি। রাসূলের ﷺ জীবনে এমন অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা আছে যেগুলোর একটি মাত্র ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য, আর তা হলো–তিনি আল্লাহর নবী, আল্লাহ তাআলাই এই মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনাগুলো ঘটিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা অর্জন করেছিলেন তা আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া কোনোমতেই অর্জন করা সম্ভব হতো না। সুতরাং সীরাহ এটাও প্রমাণ করে যে, তিনি ছিলেন আল্লাহ তাআলার মনোনীত রাসূল।

যে মুহাম্মাদ ﷺ জীবনের প্রথম চল্লিশটা বছর একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে জীবনযাপন করেছিলেন, সেই মুহাম্মাদ-ই ﷺ পরবর্তীতে একজন রাজনৈতিক নেতা, সামরিক নেতা, ধর্মীয় নেতা, বিশাল সংসারের প্রধান, আইন-প্রণেতা[1], শিক্ষক, ইমাম এবং আরও অনেক দায়িত্ব পালন করেছিলেন আর এসব ঘটেছিল তাঁর জীবনের শেষ তেইশ বছরে, নিঃসন্দেহে অবিশ্বাস্য!

উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, দুনিয়ার সর্বকালের সেরা মানুষ হলেন

---

[1] আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ এর মাধ্যমে শরীয়ার যত বিধান এসেছে তা আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে।

মুহাম্মাদ ﷺ এবং সেই মানুষটির সীরাহ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ সীরাহ। তাঁর মহত্ত্ব বা মাহাত্ম্য বোঝানোর জন্য যা-ই বলা হোক না কেন তা আসলে কম বলা হবে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব দুনিয়ার যাবতীয় মাইলফলককে ছাপিয়ে যায়। দুনিয়াতে এ যাবতকাল পর্যন্ত সর্বোচ্চ প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্তিকে নিয়ে বিখ্যাত আমেরিকান লেখক মাইকেল এইচ হার্ট একটি বই লিখেছিলেন। বইটির নাম হলো *The 100 Most influential People*। এ উদ্দেশ্যে তিনি ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে প্রভাবশালী নেতাদের জীবনী অধ্যয়ন করেছিলেন। একজন অমুসলিম হয়েও শেষ পর্যন্ত তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে, সন্দেহাতীতভাবে মুহাম্মাদ ﷺ হলেন এ যাবতকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। এই বইটি মূলত অমুসলিমদের জন্য লেখা হয়েছিল। অনেকে তার এই বাছাই নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে এই ভেবে তিনি সূচনাতে লিখেছিলেন,

'আমার তৈরি করা পৃথিবীর এ যাবতকালের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকার এক নম্বরে মুহাম্মাদকে দেখে অনেক পাঠক অবাক হতে পারে। আমার মনোনয়ন নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠতে পারে। আসলে পুরো ইতিহাসে একমাত্র তিনিই হলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি আধ্যাত্মিক এবং দুনিয়াবী–উভয় জায়গাতেই সর্বোচ্চ সফলতার ছাপ রেখেছেন।' এরপর তিনি আরও বলেছেন, 'দুনিয়াবী ও আধ্যাত্মিক উভয় পর্যায়ে মুহাম্মাদের ﷺ অসাধারণ প্রভাব দেখে আমি তাঁকে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা হিসেবে বাছাই করেছি।'

মাইকেল হার্ট সত্যের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মুহাম্মাদ ﷺ যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এরপর তিনি তার পাঠকদের কাছে এই বলে ক্ষমা চেয়েছিলেন যে, 'আমার কিছুই করার ছিল না', অর্থাৎ তালিকায় মুহাম্মাদের ﷺ উপরে রাখার মতো আর কাউকে তিনি পাননি। যদি তাঁকে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের যেকোনো একটি দিক দিয়ে বিচার করা হয়, যেমন, সামরিক বাহিনীর নেতা হিসেবে, তবে দেখা যায় যে, তিনি সামরিক নেতা হিসেবে সবার চেয়ে সেরা ছিলেন। আবার ধর্মীয় নেতা হিসেবেও তিনি অসাধারণ ছিলেন। কাজেই যে দিক থেকেই বিচার করা হোক না কেন, যতভাবে তাঁর জীবন ব্যবচ্ছেদ করা হোক না কেন, তাঁর জীবনের যেকোনো একটি দিকই তাঁর সেরা হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এখানে মনে রাখা জরুরি যে, সীরাহ হচ্ছে আল-মুস্তাফার জীবনী। মুস্তাফা মানে হলো যাকে বাছাই করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে সবার মধ্য থেকে বাছাই করেছেন। মুহাম্মাদ ﷺ হলেন আল মুস্তাফা আল খালক্বি। তিনি আল্লাহ তাআলার সমগ্র সৃষ্টির মধ্য থেকে নির্বাচিত।

সীরাহশাস্ত্র ও হাদীসশাস্ত্রের পার্থক্য

সীরাহ ও হাদীসশাস্ত্র জ্ঞানের দুটি ভিন্ন শাখা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই দুটি শাখার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু এই দুইটি শাখার নিয়মরীতি একে অপর থেকে অনেকাংশে আলাদা।

হাদীসের আলিমগণ নিয়মনীতির ব্যাপারে বেশ কঠোরতা অবলম্বন করেন। কিন্তু সীরাহর আলিমগণ এ ব্যাপারে বেশ ছাড় দেন। এর কারণ হলো, হাদীসের সত্যতা বা ইসনাদ যাচাই করার পর তা থেকে হুকুম-আহকাম প্রতিপাদন করতে হয়, তাই মুহাদ্দিসগণ সর্বদা হাদীসের সত্যতা যাচাইয়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকার চেষ্টা করেন যেন হাদীসগুলোর ইসনাদ ঠিক থাকে। দুর্বল ইসনাদের হাদীসের উপর ভিত্তি করে যেন কাউকে ইবাদাত করতে না হয় তা চিন্তা করেই আলিমগণ হাদীসের নিয়মনীতির ব্যাপারে এত কড়াকড়ি আরোপ করেন।

কিন্তু সীরাহর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এমন নয়। সীরাহকে ইতিহাসগ্রন্থ হিসেবে দেখা হয়, তাই হুকুম-আহকামের উপর এর কোনো প্রভাব থাকে না। যেহেতু সীরাহর উপর ভিত্তি করে কোনো হুকুম-আহকাম নির্ধারণ করা হয় না তাই এর নিয়মকানুনের ব্যাপারে সীরাহর রচয়িতাগণ এতটা কড়াকড়ি করেন না। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, যিনি হাদীসশাস্ত্রের একজন আলিম ছিলেন, তিনি বলেছেন, 'যখন আমরা ইতিহাস নিয়ে কথা বলি তখন বেশ ছাড় দিই।' তাই দেখা যায় যে, সীরাহর রচয়িতাগণ এমন অনেক বর্ণনা সীরাহর অন্তর্ভুক্ত করেন, যেগুলো তাঁরা হাদীস হিসেবে হয়তো গ্রহণ নাও করতে পারেন। সুতরাং সীরাহ ও হাদীসের ক্ষেত্রে এটাই ছিল পূর্ববর্তী আলিমগণের গৃহীত পন্থা।

সীরাত ইবন ইসহাক্ব, সীরাতে ইবন সাদ সহ পূর্ববর্তী আলিমদের সীরাহ গ্রন্থগুলো এসব নিয়মকানুনের উপর ভিত্তি করেই লেখা হয়েছে।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে কিছু আলিম সীরাহ রচনার ক্ষেত্রে নতুন একটি ধারা সংযোজন করেছেন। তারা সীরাহর ক্ষেত্রেও হাদীসের নিয়ম প্রয়োগ করতে চান। এর পেছনে তারা যুক্তি দেখিয়েছেন, 'আমরা এমন একটি সময়ে বাস করছি যখন রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ হলো আমাদের জন্য আহকামের অন্যতম একটি উৎস। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের সময় খিলাফাত প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই কোনো হুকুম-আহকাম ধার্য করার জন্য তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনী অধ্যয়ন করতেন না, বরং তারা সীরাহ থেকে সাধারণ শিক্ষা লাভ করতেন, বিশেষ কোনো হুকুম বা মাসআলা নয়, কারণ দ্বীন ইসলাম তখন প্রতিষ্ঠিত অবস্থাতেই ছিল।'

কিন্তু বর্তমান সময়ে ব্যাপারটি ভিন্ন। কীভাবে দাওয়াহ করতে হবে, ইসলামকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে কী কী পর্যায় অতিক্রম করতে হবে প্রভৃতি বিষয়াদি জানার জন্য অবশ্যই সীরাহ অধ্যয়ন করতে হবে। তাই সীরাহ একটি ফিক্বহশাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। এ কারণে তারা বলেন যে হাদীসের নিয়মকানুনগুলো সীরাহর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা উচিত।

উদাহরণস্বরূপ, সহীহ সীরাহ আন নাব্যুওউয়াহ নামক বইটিতে হাদীসের নিয়মকানুন প্রয়োগ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থ, যেমন, বুখারি, মুসলিম, সুনান আবু দাউদ প্রভৃতিতে সীরাহ সম্পর্কিত যে হাদীসগুলো আছে সেগুলো একত্রিত

করেছেন এবং এর উপর ভিত্তি করেই রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ রচনা করেছেন। অর্থাৎ পূর্ববর্তী আলিমদের রচিত সীরাহ, যেমন, সীরাতে ইবন ইসহাক্ব বা সীরাতে ইবন হিশাম ইত্যাদি থেকে সাহায্য নেওয়ার বদলে তারা বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থসমূহের সাহায্য নিয়েছেন। সাঈদ হাওয়া হাদীসের উপর ভিত্তি করে আল-আসাস ফীস সুন্নাহ নামক একটি বই লিখেছেন। এরকম আরও কিছু বই রয়েছে যেগুলো এই রীতি অনুসরণ করেছে।

এদিক দিয়ে ইবন কাসির অন্যান্য সীরাহ গ্রন্থ থেকে বেশ আলাদা, কারণ ইবন কাসির পূর্ববর্তী আলিমদের রচিত সীরাহর বই থেকে যেমন তথ্য সংগ্রহ করেছেন, ঠিক তেমনি হাদীসগ্রন্থগুলো থেকেও সাহায্য নিয়েছেন। তাই তাঁর বইয়ে যেমন বুখারি থেকে বর্ণিত হাদীস দেখা যায় তেমনি ইবন ইসহাক্ব থেকে বর্ণিত বর্ণনাও দেখা যায়।